বাংলা নাট্যে নারী কুশীলব

সুদীপ চক্রবর্তী

ভূমিকা

বিশ শতকের শেষভাগ এবং একুশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যেই আবহমান বাংলা নাট্যের জন্ম, বিকাশ ও লালন বিষয়ক ঔপনিবেশিক বিভ্রান্তির জাল ছিড়ে গেছে। এদেশীয় নগরায়তনিক নাট্যচর্চায় পাশ্চাত্য আরোপিত প্রসেনিয়াম মঞ্চভিত্তিক আধিপত্যের বিস্তি মাত্র দেড়শ বছরের। তথাপি বাংলা নাট্যকলার সুদীর্ঘ ঐতিহ্য অনুধাবন এবং তার পক্ষে সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণের ফলে বাংলার গৃহাঙ্গন-মাঠ-ঘাট-গ্রাম-গঞ্জ-হাট-জনপদে বিকশিত ও চর্চিত গান-নাচ-বাদ্য-অভিনয় সহযোগে উপস্থাপিত গল্পমূলক বা গল্পহীন পরিবেশনার নাট্যধারা বাংলাদেশের নগরায়তনিক নাট্যকর্মাদের নিকট আজ পরিচিত।

দৈনন্দিন জীবন যাপনে পাশ্চাত্য আবিস্কৃত সকল যান্ত্রিক ও কারিগরি সুবিধা ভোগ করছি সত্য; কিন্তু এ সত্য স্বীকার করার অর্থ এই নয় যে, 'পাশ্চাত্য'ই শুধু 'সত্য', 'জ্ঞান' ও 'ক্ষমতা'র তালিকায় হালে বা অতীতে অগ্রগণ্য। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আবিস্কৃত বৌদ্ধ বিহার, স্থাপত্য, নিত্য ব্যবহার্য তৈজসপত্র, হস্তাঙ্কিত রেখাচিত্র সুপ্রাচীন ঐতিহ্যিক নিদর্শন বহন করে। সর্বশেষ, নরসিংদী অঞ্চলে উয়ারী-বটেশ্বর বাংলার দু'হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন নিদর্শন বলে স্বীকৃত। তাই গত শতকের আশির দশক থেকে বাংলাদেশের নগরায়তনিক নাট্য-তরুণরা 'প্রসেনিয়াম মঞ্চ' ভিত্তিক নাট্যচর্চাকে একটি 'বিদেশী' ও 'আরোপিত' নাট্যরীতি বলেই জেনেছেন। ফলে তরুণ প্রজন্ম বাংলার মাটি ও মাঠের লালিত-পালিত বিচিত্র ও বহুমাত্রিক পরিবেশনার

আঙ্গিক, বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যিক ধারা অবলম্বনে-অনুসরণে নগরায়তনিক নাট্যচর্চায় নানারকম নীরিক্ষা-পরীক্ষা করে চলেছেন।

বাংলা নাট্যের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের ধারায় পরিবেশনা আয়তন, আলো, পোশাক, দ্রব্য, রূপসজ্জা, দর্শক-অভিনেতার মনোজাগতিক ঐকতান ও স্থানিক সম্পর্ক এবং অভিনেতৃর চরিত্র রূপায়ণসহ সবক্ষেত্রে মোহহীন, জাদুহীন সহজ-সরল পরিবেশনায় নারী কুশীলবের অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নরূপে পরিগণিত। পাশ্চাত্যের মঞ্চে যখন নারী কুশীলবের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল, তারও সহস্র বছর আগে থেকে প্রাচ্যের বঙ্গ জনপদে পরিবেশনা শিল্পকলায় নারী কুশীলবের উপস্থিতির প্রামাণিক চিহ্ন মেলে। রাষ্ট্র, রাজনীতি, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক প্রথা, আর্থিক বিনিময় প্রভৃতির পরিবর্তন, বিবর্তন ও অনুবর্তন মিলে স্থানীয় পরিবেশনায় নারী কুশীলবের উপস্থিতি কোথাও পেশাভিত্তিক, কোথাও সৌখিন, কোথাও আবার ধর্মীয় কৃত্যে অংশগ্রহণের রূপ নিয়ে আজো বিদ্যমান। চলমান প্রবন্ধ বাংলা নাট্যে নারী কুশীলবের অংশগ্রহণ, প্রবহমান সময়ের ধারায় অংশগ্রহণজনিত সংকট-সংঘর্ষ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নারী কুশীলবের সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় ভূমিকার একটি প্রত্যবেক্ষণমূলক এবং সংশ্লিষ্ট গবেষকগণের মাঠ-পর্যবেক্ষণভিত্তিক রচনা পাঠ-উত্তর অনুসন্ধান মাত্র।

নাট্যভিনয়ে নারী কুশীলবের অংশগ্রহণের ইতিহাস ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বাংলা নাট্যাভিনয়ে নারী কুশীলবের অংশগ্রহণের ইতিহাস অনুসন্ধানের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস হতে পারে উদ্দিষ্ট সময়ে রচিত পাণ্ডুলিপিসমূহ। স্থানীয় নাট্যকলার 'কথানাট্য' ও 'নাটগীত' ঐতিহ্য যেসব উপাদানে সমন্বিত, তা হলো, নৃত্য-গীত-বাদ্যযোগে বর্ণনাত্মক অভিনয়, চরিত্র ভূমিকায় অভিনয়, উত্তম পুরুষে সংলাপ, দ্বন্দ্বের অনুপস্থিতি এবং রসবিস্তার। এখানে একজন কুশীলব, নট বা নটী যাই হোন, কেবল অভিনেতা/নেত্রীই নন, একই সাথে একজন নাচিয়ে বা/এবং গাইয়েও। এই পটভূমিতেই আমরা বাংলা নাট্যাভিনয়ে নারী কুশীলবের নিদর্শন অনুসন্ধান করতে পারি। যেহেতু বাংলা বৃহত্তর ভারতীয় (উপমহাদেশীয়) সংস্কৃতির মূলস্রোতজাত, সেহেতু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যও প্রাসঙ্গিকভাবে অন্বিষ্ট। প্রাচীন ভারতে প্রথম সহস্রাব্দে সংকলিত 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'কঠ উপনিষদ', 'ঐতিরেয় ব্রাহ্মণ', 'কামসূত্র' (বাৎসায়ন) এবং 'মহাভাষ্য' (পতঞ্জলি) ইত্যাদি গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে নারী কুশীলবের অংশগ্রহণ পাওয়া যায়।[১]

কৌটিল্য-এর 'অর্থশাস্ত্র' অনুসারে জানা যায়, খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতক নাগাদ ভারতীয় উপমহাদেশে সম্পূর্ণ নারী কুশীলব দ্বারা অভিনীত 'স্ত্রীপ্রেক্ষা' নামক একপ্রকার নাট্যাভিনয় প্রচলিত ছিল এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় নারী কুশীলবের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। এ সংক্রান্ত আলোচনার সমর্থন মেলে দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে সংকলিত নাট্যকলা সম্পর্কিত তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক গ্রন্থ 'নাট্যশাস্ত্র' থেকে। উত্তর ভারতীয়

নাট্যচর্চার ধারা যে অষ্টম শতকের বাংলাতেও প্রচলিত ছিল তা বোঝা যায় পৌণ্ড্রবর্ধনের কার্ত্তিকেয়ের মন্দিরে দেবদাসীদের নৃত্যগীতাভিনয়ের সাথে নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত বিভিন্ন বিধানের সাজুয্য দেখে।[২]

অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে পাহাড়পুর এবং শেষার্ধে ময়নামতি বৌদ্ধ মন্দিরের গায়ে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে চিত্রিত রয়েছে অসংখ্য নৃত্যরত নারী-পুরুষ মূর্তি। 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণ' এবং 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ'-এ নাটকে উল্লেখ করা হয়েছে নিমশ্রেণীর শূদ্র হিসেবে। কৌটিল্যের মতো দিকপাল 'অর্থশাস্ত্র'-এ বলেছেন, গান ও নাচ হলো শূদ্রদের পেশা। রাজসভা এবং সম্ভ্রান্ত মহলের সাথে সম্পৃক্ত নারী কুশীলবগণের সামাজিক অবস্থান বিষয়ে এটুকু উল্লেখই যথেষ্ট যে, বেদোত্তর যুগ হতে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদ নীতি ও আদর্শের দৃষ্টিতে এঁরা ছিলেন চরমভাবে অবহেলা ও অবজ্ঞার পাত্রী।[৩]

প্রাচীন বাঙলা নাট্যরীতির প্রামাণ্য হিসেবে বারো শতকে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেব বিরচিত 'গীতগোবিন্দ' একটি আসরকেন্দ্রিক পরিবেশনমূলক কাব্য। গান-নাচ-বর্ণনার মাধ্যমে এ কাব্য আসরে পরিবেশন করতেন পদ্মাবতী, কবি জয়দেব পত্নী এবং মন্দিরের নৃত্য-পটিয়সী সেবাদাসী।[৪] অনেক গবেষক জয়দেবকে মধ্যযুগ অর্থাৎ ষোল শতকে কোচবিহারের রাজকবি বলেছেন। মুসলিম শাসনাধীন অঞ্চল ব্যতীত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা এবং তৎসহ সমগ্র পূর্বাঞ্চলের দরবারী সংস্কৃত নাট্যে নারী কুশীলবের উপস্থিতি একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই সংস্কৃত নাট্যচর্চা ব্যতিরেকে, সপ্তম থেকে দশম শতকের মধ্যে রচিত বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ'-এও নারী কুশীলবের উল্লেখ রয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও নারী কুশীলবসমৃদ্ধ নাটগীত ঐতিহ্যের কিছু উদাহরণ রয়েছে। বলাবাহুল্য, উল্লেখিত নারী কুশীলবগণের সামাজিক অবস্থান ছিল গণিকার সমপর্যায়ের। তবে মুহম্মদ খান রচিত 'সত্যকলি বিবাদ সংবাদ' (১৬১৫)-এ দেখা যায়, সম্ভ্রান্ত বংশীয় নারীগণও অভিনয়কলা চর্চা করতেন। তবে তাদের পরিবেশনা ছিল কেবল পারিবারিক অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক।[৫] আহমদ শরীফ বলেন, বিবাহোৎসব বা খৎনা, কান-ফোড়ন, আকিকা, অন্ন-প্রাশন, নাম-রাখা, গায়ে হলুদ ও হাতে মেহদি প্রভৃতিতে বাদ্য-বাজি, নাচ-গান, আবির-ফাগু, সোহাগ, কেশর-অগুরু-চুয়া, আতর, রঙ মাখা-ছোড়া, কাদা ছোড়া প্রভৃতির সাথে মেয়েলি নাচগান হতো। ... সামাজিক উৎসবে-পার্বণে, নাচ-গান-বাদ্য-প্রমোদের জন্য ছিল নীচ জাতীয় গাইয়ে-বাজিয়ে-নাচিয়ে-নাটুকে বৃত্তিজীবি। উচ্চবিত্তের অভিজাত সামন্ত ও রাজ-পরিবারের লোকেরা কলা চর্চা করতো নিজেদের বা অন্তরঙ্গজনের চিত্তবিনোদনের জন্যে। নারী শিক্ষাও একেবারে বিরল ছিল না।[৬]

১৪২৫-৩২ সালের মধ্যে মা হুয়ান (Ma Huan) কৃত 'Ying Yai Sheng-Lan' গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে রাজকীয় ভোজসভায় পেশাদার নারী নৃত্য ও কণ্ঠশিল্পীগণ জমকালো পোশাক সজ্জিত হয়ে পুরুষ যন্ত্রীদের

সাথে অভিনয় অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন। অপর চীনা পর্যটক সি ইয়াং চাও কুয়্যা তিয়েন লু তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, উৎসব-পার্বণে অতিথি আপ্যায়নকালে অভিনেত্রী ও নটী দ্বারা নৃত্য-গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকতো। পনেরো থেকে ষোল শতকের মাঝামাঝি মোহাম্মদ কবির রচিত 'মনোহর মধুমালতী' পুঁথিটিতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় প্রজাদের জন্য আয়োজিত নাটগীত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গতে অপরূপ সাজে সজ্জিতা নারী কুশীলবের পরিবেশনার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭] বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ, ঢাক, ঢোল, করতাল, ডম্বরু, কাণ্ড, (কাড়া) কাহল প্রভৃতি ছিল মুখ্য বাদ্যযন্ত্র। মন্দিরে দেবদাসীরা ও বেশ্যারা এবং হাড়ি-ডোমেরা গাইয়ে-বাজিয়ে-নাচিয়ে ছিল।[৮] উল্লেখযোগ্য দুজন নারী কবি-কুশীলবের নাম নেয়া এখানে প্রাসঙ্গিক। ষোল শতকের চন্দ্রাবতী এবং উনিশ শতকের অক্ষয় বাইতিনি। তাঁরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

মধ্যযুগের পরিবেশনামূলক সাহিত্যে নারী কুশীলবের এসকল উল্লেখ যখন সুস্পষ্টভাবে তাঁদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, ঠিক তখন বিস্ময়করভাবে চৈতন্যের কৃষ্ণ যাত্রা সম্পূর্ণরূপে পুরুষ কুশীলব দ্বারা অভিনীত হতে দেখা যায়। কারণ চৈতন্যের নিকট মানুষ ও ঈশ্বরের সম্পর্ক ছিল রাধা-কৃষ্ণের সমতুল্য। তাই কৃষ্ণ যাত্রায় নারী কুশীলবের পরিবর্তে চৈতন্য নিজেই রাধার ভূমিকায় কৃষ্ণের পার্থিব লীলায় অংশগ্রহণ করেন। উপরন্তু তৎকালীন সমাজে নারী কুশীলবকে পতিতার সমতুল্য করে দেখা হতো।[৯] অনেক গবেষক মনে করেন, আবহমান বাংলার নাট্য পরিবেশনার প্রতিটি শাখায় পুরুষ কুশীলব দ্বারা নারী চরিত্র রূপায়ণ প্রবণতা সম্প্রসারিত হওয়ার মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক ভিত রচিত হয়েছে প্রধানত চৈতন্য ও তাঁর শিষ্যবৃন্দের অভিনয়কালে নারী ভূমিকায় রূপদানকে কেন্দ্র করে। দেশজুড়ে কৃষ্ণ ও চৈতন্য, শ্রীরামচন্দ্র, শিব-কালী, মনসা, বৌদ্ধ ধর্ম ও নাথ সম্প্রদায়, মুসলিম পীর-ফকির ও বীর, প্রেম-প্রণয় ও ধর্মনিরপেক্ষ আখ্যানকে ভিত্তি করে অঞ্চলভেদে বিচিত্র ও বহুমাত্রিক পরিবেশনার যেসব তথ্য পাওয়া যায় এবং দেখা যায়, তাতে নারী চরিত্রে পুরুষ কুশীলবের রূপদান চিত্র যথেষ্ট সম্প্রসারিত। এর মধ্যে যেসব পরিবেশনায় নারী কুশীলবের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় (সংযুক্ত ছকটি দেখুন), বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর ও সর্পদেবী মনসার উদ্দেশ্যে নিবেদিত 'রয়ানি' পরিবেশনাকে তার মধ্যে আদি ও অন্যতম বলে সৈয়দ জামিল আহমেদ তাঁর গবেষণা প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। এই পরিবেশনায় বরিশাল অঞ্চলে সুচিত্রা সার্বাগ্য-এর নেতৃত্বাধীন একটি বিখ্যাত রয়ানি দলের নাম তাঁর প্রবন্ধে জানা যায়।[১০] সাইমন জাকারিয়ার প্রত্যবেক্ষণমূলক রচনা থেকে জানা যায়, বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ থানার শৌলখালি গ্রামের 'রয়ানী' দল 'শ্রী মীরা রাণী সম্প্রদায়'-এর পরিবেশনার সরকার মীরা রাণী মিস্ত্রি এবং মূল পালা পরিবেশনকারীরাও নারী। একই বিষয়ভিত্তিক রচনা রংপুরের 'বিধবাদের বিষহরির গান'-এ তিনি জানান, গান ও নাচ নির্ভর এই নিরাভরণ বিষহরির গান গ্রামের বিধবা নারীরা রাতব্যাপী পরিবেশন করেন।[১১]

পদ্মাপুরাণ দেবী মনসার উদ্দেশ্যে পরিবেশিত হলেও কুষ্টিয়ার এমন একটি দলের কর্ণধার আহমেদ একজন মুসলমান এবং তাঁর দলে স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেন নারী কুশীলববৃন্দ। খুলনার পাইকগাছা অঞ্চলের 'বেহুলা-লক্ষ্মান্দর' আখ্যানভিত্তিক পরিবেশনা 'ভাসান'-এর অভিনেত্রী এক অন্ধ মহিলা।[১২] চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে দেল ঠাকুরের পূজা উৎসবে খুলনা অঞ্চলে বিভিন্ন গ্রামের সনাতন ধর্মাবলম্বী শিশু-তরুণ-যুবা মিলিত দল দিনব্যাপী গ্রাম-গ্রামান্তরে পৌরণিক বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বনে নির্বাক অভিনয়সমৃদ্ধ দৃশ্য উপস্থাপন করেন। নৃত্য-বাদ্য সহযোগে নাট্যমূলক এসব দৃশ্য উপস্থাপনে বারো বছর পর্যন্ত শিশু-কিশোরী কুশীলবকে দেবী গৌরী, দুর্গা, রাধা ও কালী চরিত্রে রূপদান করতে দেখা যায়। উল্লেখ্য, এ অঞ্চল ব্যতীত বাংলাদেশের অন্যত্র কোন নারী কুশীলব দ্বারা 'দেবী কালী' চরিত্র অভিনয় করার তথ্য পাওয়া যায় না। শুধু নারী কুশীলব দ্বারা পরিবেশিত কৃত্যমূলক ধামাইল বা ধামালী এখনো বিদ্যমান। সিলেট, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সূর্যব্রত উপলক্ষ্যে নৃত্য-গীতসমৃদ্ধ 'সূজাই পূজার ধামাইল' এবং বিয়ের পূর্বরাত্রির অধিবাসকৃত্য উপলক্ষ্যে একই রীতিতে 'বিয়ার ধামাইল' পরিবেশিত হয়। পূর্বে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মাবলম্বীর নিকট বিয়ার ধামাইল নারীদের কৃত্যমূলক গীত ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম পরিবার এই পরিবেশনাকে কৃত্যমূলক মনে করেন না বলে মুসলিম বিয়েতে এখন 'ধামাইল' পরিবেশনে আগ্রহ নেই বললেই চলে। তবে সিলেটের প্রান্তিক অঞ্চলে মুসলিম জেলে সম্প্রদায়ের বিয়েতে ধামাইল পরিবেশিত হতে দেখা যায়। ফরিদপুর অঞ্চলের শ্রী শ্রী রাধা-কৃষ্ণ সম্প্রদায় সনাতন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আমন্ত্রণে বিভিন্ন কৃত্যানুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণ ও দেবী মনসা বিষয়ক পালা পরিবেশন করেন। পালাগুলোর মধ্যে 'বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর' পালা ও 'কৃষ্ণলীলা'য় লক্ষ্মীন্দর ও কৃষ্ণ চরিত্রে একজন তরুণী কুশীলবকে অভিনয় করতে দেখা যায়।[১৩]

'দেবী কালী' চরিত্র অভিনয়ে এক কিশোরী

রামায়ণ গান সাধারণত পুরুষ কুশীলব দ্বারা গঠিত হলেও ব্যতিক্রম হলো নেত্রকোনার বিভা রানী দাস পরিচালিত দলটি। কারবালার কিংবদন্তীভিত্তিক পরিবেশনা এবং করুণ ও বীর রস সঞ্চারণক্ষম জারি সাধারণত পুরুষ কুশীলব দ্বারা অভিনীত ও গীত হয়। কিন্তু একটি বিশিষ্ট ব্যতিক্রম হলো সাতক্ষীরা খুলনা অঞ্চলের রুবিনা বেগম পরিচালিত দল। নেত্রকোনার গফুর মিঞার সং দলে স্ত্রী চরিত্রে রূপদান করেন নারী কুশীলব। কবির লড়াই ও বিচার গানেও নারী কুশীলব অংশ নেন। চট্টগ্রামের খুকুরানী শীল ও মানিক শীলের দলটি এমন এক উদাহরণ।[১৪] দেশের বিভিন্ন আসরে তত্ত্বালাপমূলক ভাবসঙ্গীত ও কবির লড়াই পরিবেশনে ফরিদপুরের দুই সহোদরা ডলি পারভীন ও শিউলি পারভীন-এর নাম জানা যায়।[১৫] গীত-নৃত্য-বাদ্য নির্ভর পৌরণিক আখ্যানভিত্তিক যাত্রা আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে ইউরোপীয় আদর্শ অনুসৃত পিকচার ফ্রেম প্রসেনিয়াম থিয়েটারধর্মী অভিনয়রীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনপদ্ধতি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। গবেষক তপন বাগচী'র প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, ১৯১৫ সালে বাংলাদেশে ঝালকাঠিতে নারী পরিচালিত প্রথম যাত্রাদল 'লেডি কোম্পানি' গঠিত হয়। এর অধিকারী ছিলেন শ্রী বোঁচা নামের এক নারী। যাত্রায় নারী শিল্পীর অংশগ্রহণ শুরু হয় এই দলের মাধ্যমে।[১৬] বাংলাদেশের যাত্রাগানকে পারিবারিক নাট্যচর্চার ঐতিহ্য হিসেবে নিরূপণ করে সাইমন জাকারিয়া তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, বিভিন্ন যাত্রাদলে স্বামী-স্ত্রী, ক্ষেত্রবিশেষে পরিবারের সবাই মিলে অর্থাৎ বাবা-মা-ভাই-বোন, জামাই-মেয়ে, ছেলে-বউ, নাতি-নাতনী, দাদা-দাদীকে অভিনয়ে অংশগ্রহণ, পালা পরিচালনা বা বাদ্য পরিবেশন করতে দেখা যায়। পারিবারিক সম্পৃক্ততা থাকা সত্ত্বেও যাত্রাশিল্প অধিকাংশক্ষেত্রে দেশের বৃহত্তর জনসাধারণ ও প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের অবহেলা ও নিগ্রহের মুখে পড়েছে অশ্লীলতার অভিযোগে।[১৭]

কারবালায় শহীদ হাসান হোসেন বিষয়ক পরিবেশনা

আলোচনায় পুরুষ ও নারী কুশীলব উভয়ের অংশীদারিত্ব স্বীকৃত। কিন্তু মধ্যযুগের প্রথমদিকে (তেরো থেকে ষোলো শতক) একটি স্পষ্ট পরিবর্তন ঘটায় এই প্রেক্ষাপট থেকে আপাতঃদৃষ্টিতে নারী কুশীলব অন্তর্হিত হয়েছিলেন বলে সৈয়দ জামিল আহমেদ তাঁর এক গবেষণা প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। তিনি এই অন্তর্ধানের পেছনে তিনটি কারণ নির্ণয় করেছেন। এগুলো: ১. মুসলিম শাসন, ২. বৈষ্ণব নাট্য-গীত চর্চা ও ৩. সামাজিক রাজনৈতিক প্রভাব বিচ্ছিন্ন নান্দনিক চাহিদা যা শক্তির 'লাস্য' ও 'তাণ্ডব' ধারণা স্বীকার করে।[১৮] প্রবন্ধ পাঠে জানা যায়, মুসলিম শাসনামলে দরবারে বিনোদন হিসেবে নৃত্য গুরুত্ব পেলেও অমুসলিম আখ্যানসমূহ রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতার অভাবে পরিত্যক্ত বা রূপান্তরিত হয়। ফলে ষোলো শতকের ভেতরে রাজপ্রাসাদ ও মন্দিরভিত্তিক নাট্যাভিনয় হতে নারী কুশীলব অন্তর্হিত হয়। বৈষ্ণব প্রভাবে নারী কুশীলব অন্তর্হিত হন, তা বলা যাবে না। কারণ, নারী-পুরুষ মিলিত অভিনয় প্রয়োগে লেবেদেফ ও নবীনচন্দ্র বসু সমর্থ হন। এছাড়াও সংবাদপত্র সূত্রে উনিশ শতকে যাত্রা, কীর্তন ও ঝুমুর ইত্যাদি পরিবেশনায় পতিতাদের অংশগ্রহণ সম্বন্ধে জানা যায়।[১৯] নাট্যশাস্ত্রের ঐতিহ্যে অভিনয়কলার নান্দনিক প্রয়োজন অনুসারে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় কুশীলবের ক্ষেত্রে 'লাস্য' ও 'তাণ্ডব' শক্তির প্রয়োগ স্বীকৃত হয়েছে। ইউজেনিও বারবা এ কারণেই দাবী জানিয়েছেন যে, চরিত্র চিত্রণ বিচারে কুশীলব নারী কি পুরুষ- সে বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক। অর্থাৎ 'পৌরুষ' এবং 'নারীত্ব' যথাক্রমে পুরুষ ও নারী দ্বারাই যে সর্বোত্তমভাবে রূপায়িত হবে এমনটা অত্যাবশ্যক নয়। 'লাস্য' ও 'তাণ্ডব' শক্তির সাহায্যে যখন কুশীলব নিজ 'উপস্থিতি'কে দৃশ্যমান ও চরিত্রে রূপান্তরিত করেন, তখনই পৌরুষ বা নারীত্বকে প্রত্যক্ষ করা যায়।[২০]

তেরো শতকে মুসলিম ও ষোলো শতকে বৈষ্ণব- পরপর এই দুই পিতৃতান্ত্রিক আঘাতের পর বাংলা অঞ্চলে মাতৃতান্ত্রিকতার ভিত ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ষোলো শতকের শেষ নাগাদ বাংলায় একটি প্রগাঢ় সামাজিক পরিবর্তন লক্ষ্যনীয়: পিতৃতান্ত্রিকতার সুস্পষ্ট অগ্রগতি। পরিণতিতে পুরুষ আধিপত্য ক্রমশ প্রবল হয় এবং নারী প্রেরিত হয় অন্তঃপুরে। পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিতে জনসমক্ষে নারী কুশীলবকৃত সকল প্রকার পরিবেশনা 'কাম প্রবৃত্তিমূলক' লেবেল দ্বারা চিহ্নিত হয়। উপরন্তু নারী কুশীলবকৃত পরিবেশনাসমূহ পুরুষতন্ত্রে বিভেদ ও উচ্ছৃঙ্খলা সৃজনে সক্ষম হেতু এসকল পরিবেশনা পুরুষ আধিপত্য বিস্তারের পথে বাধাস্বরূপ ও অনাকাঙ্ক্ষিত বিবেচিত হয়। ফলে, জনসমক্ষে নারী কুশীলবকৃত সকল প্রকার পরিবেশনাকে হয় দমন, নয় কালিমা লেপন করা হয়। কিন্তু ক্ষমতাবান অভিজাত সংস্কৃতির মূলস্রোতধারা নিশ্চিদ্র নয়; অতএব মাতৃতান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান অবশিষ্টাংশে অভিজাত মহলের অলক্ষে চলতে থাকে।[২১]

a

বাংলা নাট্যে নারী-পুরুষ কুশীলবের মিলিত ও শুধু নারী কুশীলব দ্বারা বিভিন্ন রীতিতে অভিনীত বিষয়ভিত্তিক আখ্যান পরিবেশনার যেসব তথ্য পাওয়া যায় এবং দেখা যায় তার একটি ছক উপস্থাপিত হলো। [২২ ও ২৩]

নারী-পুরুষ কুশীলবের মিলিত পরিবেশনা

আখ্যানভিত্তিক পরিবেশনার বিষয়	আখ্যানভিত্তিক পরিবেশনার অভিনয়রীতি							
	বর্ণনাত্মকরীতি	সংলাপাত্মকরীতি	মিশ্ররীতি	নাটগীত রীতি	শোভাযাত্রামূলক	অধিব্যক্তিকরীতি	প্রতিযোগিতামূলকরীতি	কথনরীতি
কৃষ্ণ ও চৈতন্য	লীলাকীর্তন	কৃষ্ণযাত্রা সাজকীর্তন		পালাকীর্তন মণিপুরী রাস নৃত্য	জন্মাষ্টমী মিছিল নৌকাবিলাস মিছিল			সুখকীর্তন
শ্রীরামচন্দ্র	রাজা হরিশচন্দ্রের শ্মশানমিলন		কুশানগান					
শিব-কালী			অষ্টকযাত্রা	শিব-গৌরীর নাচ অষ্টক গান	নীলের গাজন মহাদেব-কালীর নাচ			
মনসা	রয়ানী গান	ভাসান যাত্রা			মনসা ভাসান যাত্রা		ঝাঁপান খেলা	মনসার গান (পাঁচালী)
বৌদ্ধ ধর্ম ও নাথ সম্প্রদায়		জীয়						
মুসলিম পীর, ফকির ও বীর		ইমাম যাত্রা গাজীর যাত্রা			বেড়া ভাসান		জারি গান (দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশ)	
প্রেম-প্রণয় ও ধর্মনিরপেক্ষ		যাত্রা ঝুমুর যাত্রা মাইট্টা তামাশা						

শুধু নারী কুশীলব পরিবেশিত আখ্যান

আখ্যানভিত্তিক পরিবেশনার বিষয়	আখ্যানভিত্তিক পরিবেশনার অভিনয়রীতি							
	বর্ণনাত্মকরীতি	সংলাপাত্মকরীতি	মিশ্ররীতি	নাটগীত রীতি	শোভাযাত্রামূলক	অধিব্যক্তিকরীতি	প্রতিযোগিতামূলকরীতি	কথনরীতি
মনসা			ভাসান গান					
মুসলিম পীর, ফকির ও বীর		গাজীর যাত্রা						জারি গজল পুঁথি
প্রেম-প্রণয় ও ধর্মনিরপেক্ষ		রঙ পাঁচালী গম্ভীরা গান						

নারী কুশীলবের অংশগ্রহণে অন্যান্য পরিবেশনা

বিচার গান, সূর্যব্রত উপলক্ষ্যে সিলেট, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নৃত্য-গীতসমৃদ্ধ 'সূজাই পূজার ধামাইল', বিয়ের পূর্বরাত্রিতে অধিবাসকৃত্য উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নৃত্য-গীতসমৃদ্ধ 'বিয়ার ধামাইল', চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে দেল ঠাকুরের পূজা উৎসবে খুলনা অঞ্চলে শিশু-কিশোরীর দেবী গৌরী, দুর্গা, রাধা ও কালী চরিত্রের নৃত্য পরিবেশনা, লালনগীত, নৃ-গোষ্ঠী পরিবেশনা প্রভৃতি। [২৪]

টীকা:

১. সৈয়দ জামিল আহমেদ, নাট্যাভিনয়ে নারী কুশীলব এবং দেশজ নাট্যের প্রাসঙ্গিক ইতিহাস, "সাহিত্য পত্রিকা", রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৭ বর্ষ, সংখ্যা ২, ১৪০০ সাল, পৃ. ১২৯-১৫০
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত
৪. সেলিম আল দীন, মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২৭-২৮
৫. সৈয়দ জামিল আহমেদ, প্রাগুক্ত
৬. আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে ও সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, আগামী প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৩১-৩৪

৭. সৈয়দ জামিল আহমেদ, প্রাগুক্ত
৮. আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে ও সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, আগামী প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৪৪
৯. সৈয়দ জামিল আহমেদ, প্রাগুক্ত
১০. সৈয়দ জামিল আহমেদ, প্রাগুক্ত
১১. সাইমন জাকারিয়া, প্রণমহি বঙ্গমাতা (দ্বিতীয় পর্ব), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১৩৫-১৩৯
১২. সৈয়দ জামিল আহমেদ, প্রাগুক্ত
১৩. লেখকের মাঠ প্রত্যবেক্ষণ
১৪. সৈয়দ জামিল আহমেদ, প্রাগুক্ত
১৫. সাইমন জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-৩৬
১৬. তপন বাগচী, যাত্রাশিল্প, ড. ইসরাফিল শাহীন সম্পাদিত 'পরিবেশনা শিল্পকলা', এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২৭৪
১৭. সাইমন জাকারিয়া, বাংলাদেশের যাত্রাগান: পারিবারিক নাট্যচর্চার ঐতিহ্য ও সাম্প্রতিক চালচিত্র, আইরিন পারভীন লোপা সম্পাদিত 'যাত্রা: ঐতিহ্যের নবজাগরণ', বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৩
১৮. সৈয়দ জামিল আহমেদ, প্রাগুক্ত
১৯. সৈয়দ জামিল আহমেদ, প্রাগুক্ত
২০. Eugenio Barba and Nicola Savarese, A Dictionary of Theatre Anthropology, (London: Routledge, 1991) p. 79-81, উদ্বৃত সৈয়দ জামিল আহমেদ, প্রাগুক্ত
২১. সৈয়দ জামিল আহমেদ, প্রাগুক্ত
২২. Syed Jamil Ahmed, Acinpakhi Infinity: Indigenous Theatre of Bangladesh, The University Press Ltd, Dhaka, 2000, p. 339
২৩. সাইদুর রহমান লিপন, লোকনাট্য: পরিচয় ও বিশ্লেষণ, ড. ইসরাফিল শাহীন সম্পাদিত 'পরিবেশনা শিল্পকলা', এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২৩৬-২৭০
২৪. লেখকের মাঠ প্রত্যবেক্ষণ

লেখক : সুদীপ চক্রবর্তী, সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।